মেহেরপুর জেলায় নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ০৩(তিনটি) ইনোভেশনের তথ্যঃ

কওমি সনদের টেকসই মান নিশ্চিতকরণ ও মূল ধারার সাথে কওমি মাদ্রাসাগুলোর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে মাঠ পর্যায়ে বিশেষ উদ্যোগ

ব্যানবেইসের তথ্য মতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ১৩ হাজার ৮২৬টি কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪৬০ জন। প্রতিবছর এই সংখ্যাটা বাড়ছে এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এসব বেসরকারি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এতিম-গরীব ছাত্রের পাশাপাশি সমাজের শিক্ষিত, বিত্তবান ও উঁচু শ্রেণির সন্তানদের মধ্য থেকে হাজার হাজার মেধাবী তরুণ ভর্তি হচ্ছে। কওমি মাদ্রাসার স্বকীয়তা ও মূলনীতিসমূহকে অক্ষুন্ন রেখে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে কর্মমুখী ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার সমন্বয়–– করে এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল ধারার সাথে যুক্ত করে দক্ষ দেশপ্রেমিক মানবসম্পদে রুপান্তরিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদীসের সনদকে মাস্টার্স (ইসলামিক স্টাডিজ এবং আরবি) এর সমমান প্রদান করেছেন।

উচ্চতর ক্লাসগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ এবং আরবি বিষয়ের সিলেবাসের সাথে কওমি সিলেবাস প্রায় সমমানের হলেও মূলত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠক্রম ও পাঠদান মানসম্মত নয় এবং জীবন ও জগতের অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সেখানে অনেকাংশেই অবহেলিত ও উপেক্ষিত। ফলে কয়েকটি বিদেশি ভাষা ও ধর্মীয় জ্ঞানে তারা বুৎপত্তি অর্জন করলেও মূল ধারায় নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র ব্যতিরেকে তাদের অবদান ও অংশগ্রহণ কোনোটাই উল্লেখযোগ্য নয়। এতে মূল ধারার কর্মক্ষেত্র ও কর্মজীবীদের সাথে তাদের একটা দূরত্ব তৈরী হচ্ছে। এ অবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য ও উদ্দ্যোগ এর টেকসই সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন মাঠ পর্যায়ে দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কওমি মাদ্রাসাগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা, প্রশাসনিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও ইতিবাচক তদারকির মধ্য দিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও মাদ্রাসাগুলোর মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়ন। মেহেরপুর জেলায় অবস্থিত সর্বমোট ২৩টি কওমি মাদ্রাসায় সরকারের এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একটি বিশেষ উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা সরকারের লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উদ্যোগটি ১৫ অক্টোবর, ২০১৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ সময়কালের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়।

উদ্যোগের অংশ হিসেবে সামাজিক ও জাতীয় অনুষ্ঠানগুলোতে কওমি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্তকরণ ও উপস্থিতি বৃদ্ধিকরণ, জাতীয় চেতনা ও ঐক্যের সাথে সমন্বয় রাখতে জাতীয় পতাকা ও পতাকা দন্ড সরবরাহ, পতাকা বেদী নির্মাণ এবং নিয়মিত জাতীয় সংগীত পরিবেশনে সম্মতকরণ, ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি মাতৃভাষা ও আধুনিক শিক্ষার চলনসই মান (কমপক্ষে প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত) নিশ্চিতকরণের জন্য প্রত্যেক মাদ্রাসায় পর্যাপ্ত দক্ষ শিক্ষক নিয়োগে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার মানোন্নয়নে কম্পিউটার সামগ্রী ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ, প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকারি অনুদান হিসেবে চাল ও কম্বল বিতরণ, শরীরচর্চাকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে মাদক, জংগীবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি মাদ্রাসাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন, মতবিনিময় ও যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে কওমি ধারার সাথে মূল ধারার বিদ্যমান দূরত্ব হ্রাসের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যার ফলাফল হিসেবে জেলায় অবস্থিত সর্বমোট ২৩টি কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তারা বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুগুলোতে স্বেচ্ছায় সম্পৃক্ত হচ্ছে, অংশগ্রহণ করছে, নিজেদের স্বার্থেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, কম্পিউটার সামগ্রীর জন্য প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে সাধারণ বিষয়সমূহে (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল) শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছে। সনদের টেকসই মান নিশ্চিতকরণের জন্য স্বপ্রণোদিত হয়েই তারা নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ের সংস্কার নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। এ উদ্যোগের একটি বিশেষ অর্জন হচ্ছে মাদ্রাসাগুলোতে নিয়মিত জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন নিশ্চিত করা গেছে যা ইতোপূর্বে ছিল না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কওমি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের দাবীর প্রতি সম্মত হয়ে কওমি সনদের স্বীকৃতি দিয়েছেন, কিন্তু এ সনদের টেকসই মান নিশ্চিত করতে হলে কেবল জাতীয়ভাবে সনদের স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয় বরং একেবারে মাঠ পর্যায় থেকে মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে কওমি শিক্ষাধারার চেতনা, মনন ও পাঠক্রম এর মানোন্নয়নে নজর দেওয়া প্রয়োজন। এই সমন্বয় সম্ভব হলে কওমি-সনদের টেকসই মান নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য যেমন পূরণ হবে; তেমনি কওমি সনদধারীরাও তাদের সনদ দ্বারা উপকৃত হবে। পাশাপাশি উভয় ধারার মধ্যে নৈতিকতা ও জীবনমূখী শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটবে, কর্মক্ষত্রে প্রতিযোগিতার সক্ষমতায় সমতা আসবে। এক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত এ উদ্যোগ পথিকৃত হিসেবে পথ দেখাবে।

**ভাটপাড়া ডিসি ইকো-পার্ক এর সার্বিক উন্নয়ন**

স্বাধীন বাংলার প্রথম সরকার গঠণের স্মৃতিবিজড়িত দেশের সর্বকনিষ্ঠ জেলা মেহেরপুর। জেলার অন্যতম বৃহৎ, জনবহুল ও ঐতিহাসিক গুরুত্ববহ জনপদ গাংনী উপজেলা। প্রাচীন এই জনপদের রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্য, সমৃদ্ধ এই নগরীর আকর্ষণে যুগে যুগে এখানে ছুটে আসে বৈশ্বিক বণিক, পরিব্রাজক, প্রকৃতিপ্রেমী। এর ধারাবাহিকতায় এক সময় এখানে খুঁটি গাড়েন সাম্রাজ্যবাদি ব্রিটিশ বেনিয়া। বর্তমান গাংনীর প্রাণকেন্দ্র উপজেলা সদর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে, সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়া নামক গ্রামে কাজলা নদীর তীর ঘেঁষে স্থাপন করেন নীলকুঠি। ইতিহাস স্বাক্ষী, এই নীলকুঠিগুলো ছিল তাঁদের শাসন-শোষণ ও আধিপত্যবাদের আঁতুড়ঘর। বর্তমান ব্রিটিশমুক্ত বাংলাদেশে নীলকুঠিগুলো পতিত ও ভঙ্গুর অবস্থায় উপনিত হলেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ঐতিহ্য হিসেবে সংরক্ষণের দাবী সর্বস্তরের মানুষের। পরিতাপের বিষয় হল, জনবহুল গাংনী উপজেলা ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক, দেশের কৃষিজ অর্থনীতির চালিকাশক্তি হলেও, এলাকার অধিবাসীদের নির্মল চিত্তবিনোদনের নির্ধারিত কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলশ্রুতিতে উঠতি বয়সী তরুণ-যুবারা সময় কাটানোর উপযুক্ত জায়গা না পেয়ে জড়িয়ে পড়ছে মাদক, ছিনতাইসহ নানা অসামাজিক কার্যকলাপে।

বিবিধ সমস্যা চিহ্নিত করে এলাকার জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী, সুধিজন, সরকারি কর্মকর্তা সকলে একটি পার্ক স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেন। অলোচিত নীলকুঠি ও তৎসংলগ্ন জায়গা সরকারি খাস মালিকানাধীন। একসময় এটি হয়ে উঠেছিল মাদকসেবী, মাদক বিক্রেতা ও অপরাধীদের অভয়ারণ্য। সেই সঙ্গে সরকারি এই জায়গার প্রায় ১০০ বিঘা সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হয়ে পড়েছিল ভূমিদস্যুদের ভোগ-দখলের চারণক্ষেত্র। ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেই স্থাপনা ও ঐতিহ্য ভ্রমণে গিয়ে অপদস্ত ও হয়রানির শিকার হয়েছেন অসংখ্য দর্শনার্থী।স্থানীয় অনেকে স্ব-উদ্যোগে মাদকসেবী, বিক্রেতা ও অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন। একসময় তাঁরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন চিঠিপত্র আদান-প্রদান শেষে মেহেরপুর জেলার তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব পরিমল সিংহ মহোদয়ের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণে এলাকাবাসীর লালিত স্বপ্ন আলোর মুখ দ্যাখে। তাঁর অনড় ইচ্ছাশক্তি, ও অনুপ্রেরণায় স্থানীয় প্রশাসন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে নীলকুঠি সংলগ্ন ৩৩ একর জমিতে ‘জেলা প্রশাসক ইকো-পার্ক, নীলকুঠি’ এর কার্যক্রম শুরু করে।

চিত্তবিনোদনের জন্য স্থাপন করা হয়েছে কিডস প্লে কর্নার,টয় ট্রেন, ওয়াটার রাইড , মেরি গো রাউন্ড ও নাগরদোলা, স্পিডবোট ও প্যাডেলবোট, ক্যাবলকার , থ্রিডি থিয়েটার, মিনি চিড়িয়াখানা ইত্যাদি। অবকাঠামোর উন্নয়ন এর মধ্যে আছে সুদৃশ্য প্রবেশ ফটক ও টিকেট কাউন্টার,পাবলিক টয়লেট,অফিস কাম ফ্রেশ রুম,ক্যাফেটিরিয়া,পার্কিং লট ও গ্যারেজ স্থাপন, মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ,নীল যাদুঘর ও সংগ্রহশালা স্থাপন,লেক আইল্যান্ড কফিশপ নির্মাণ,উন্মুক্ত সভামঞ্চ (পোডিয়াম) নির্মাণ, শপিং কর্নার নির্মাণ,পেরিফেরি ওয়াকওয়ে নির্মাণ,মোটেল/রিসোর্ট নির্মাণ। এছাড়া বর্তমানে ০১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার সীমানা প্রাচীরসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ চলমান রয়েছে।

**কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, নিরাপদ ফল-সবজি, উৎপাদনে মডেল খামারবাড়ি স্থাপন।**

কৃষিবিদ ড. মো. আখতারুজ্জামান।

"যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন, কৃষি হলো তাঁদের জন্যে"। কৃষি হচ্ছে আদিম ও সম্মানজনক পেশা। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের অধিকতর উৎকর্ষ সাধনের এইক্ষণে দাঁড়িয়ে  মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত বহুধা অঁচলে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে কিন্তু বিজ্ঞান আজও কৃত্রিম কোন খাদ্য তৈরি করতে পারিনি। খাদ্যের জন্যে মানুষ এখনো নির্ভর করে প্রকৃতির উপরে। ফলে যতদিন মানব অস্তিত্ব পৃথিবীতে বর্তমান অবস্থায় বহমান থাকবে ততদিন মানুষকে তার খাদ্যের জন্য কৃষির উপরেই নির্ভর করতে হবে।

কৃষি প্রধান দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। এ দেশের মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ু কৃষি কাজের জন্য অত্যন্ত উপযোগি।স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যূদয়ের অব্যবহিত পরে সাড়ে ০৭ কোটি জনমানুষের দেশে ছিল খাদ্য ঘাটতি; আর এখন সেই দেশে জনসংখ্যা সাড়ে ষোলো কোটি এবং আবাদযোগ্য জমি পরিমাণ অর্ধেকের নিচে নেমে আসলেও দেশ আজ খাদ্য স্বয়ম্ভর। বস্তুত: কৃষক কৃষিবিদ, ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ও এঁদের সহযোগিদের সস্মিলিত প্রয়াসেই খাদ্য ঘাটতির দেশ আজ খাদ্য স্বয়ম্ভরতার দেশে পরিণত হয়েছে।

বন্য, খরা জলোচ্ছ্বাস আমাদের নিত্যদিনের সমস্যা। এসব বৈরিতাকে পাশ কাটিয়ে আমাদের কৃষিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া আমাদের জন্যে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যে দেশ বিদেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষি প্রযুক্তি একটা চলমান প্রক্রিয়া। ফলে সময়ের পথ পরিক্রমায় আজকের লাগসই কৃষি প্রযুক্তি আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। সেদিকের বিবেচনায় কৃষি বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন আর কৃষির সেই গবেষণালব্ধ কার্যক্রম জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বৃহৎ সরকারি সংস্থা কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরে।

অনান্য সরকারি দপ্তর পরিদপ্তরের ন্যায় সময় খরচ ও ভ্রমণ সাশ্রয়ী জনবান্ধব সেবা উদ্ভাবনের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল অনুসঙ্গককে নির্দেশনা দেয়া রয়েছে।সেটারই ধারাবাহিকতায় আমি আমার সকল সহকর্মীদের সহায়তায় আমার মেহেরপুর জেলা দপ্তরের সন্মুখের পরিত্যক্ত জায়গাতে একটা "খামারবাড়ির" মডেল তৈরি করেছি। একজন কৃষক তার বসতবাটির জমির আয়তন বুঝে কিভাবে তার বসতবাড়িকে কৃষির সকল প্রযুক্তির সমন্বয়ে ফল ফলাদি, শাকসব্জি, গাছপালা, গবাদিপশু ও মৎস্য চাষাবাদের সমন্বয়ে করতে পারবেন সেটা জানতে পারবেন, আমাদের এই মডেল থেকে।

আমাদের অফিস চত্বরের সামনে স্থাপিত খামিরবাড়িটি একটা জীবন্ত মডেল।আমাদের মডেল খামারবাড়িটিকে একটা মিনি এগ্রোটেকনোজিক্যাল পার্কও বলা যেতে পারে।একজন আগ্রহী কৃষক মডেল খামারবাড়িতে এসে দেখতে ও জানতে পারবেন; বিভিন্ন দুষ্পাপ্য ফল সবজির গাছ, চিত্ত বিনোদনের জন্য মৌসুমি ও বছরব্যাপী চাষ হয় এমন ফুল ও সুদৃশ্য গাছপালা; বারো মাসে বার ফলের বাগান; বছরব্যাপী সবজি পাওয়ার কালিকাপুর মডেল; ঔষুধি বাগান; ধানচাষের সকল প্রযুক্তি; ড্রিপ ইরিগেশন; জৈব সার; ভার্মি কম্পোস্ট; ট্রাইকোকম্পোস্ট প্রযুক্তি; ক্লিন কুকিং সিস্টেম; বয়োগ্যাস প্লান্ট; গরু মোটাতাজাকরণ; পোল্ট্রি ফার্মিং; ফডার ক্রপের চাষাবাদ; মিনি পুকুরে মৎস্য চাষ; ছাদ কৃষি; পানিবিহীন সব্জি চাষ ইত্যাকার বিষয় সম্পর্কে।

মডেল খামারবাড়ির সবচে আকর্ষণীয় বিষয় হলো প্রতিটি গাছপালা তরুলতার পাশে পরিচিতিমূলক নামফলক রয়েছে। সেইসাথে খামারবাড়ির চারপাশে অসংখ্য কৃষি প্রযুক্তির কথকতা সম্বলিত বড় বড় বিলবোর্ডও রয়েছে।

মডেল খামারবাড়ি অনুসরণ করলে কৃষক প্রতিনিয়ত কৃষির লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তির সম্পর্কে জানতে বুঝতে ও শিখতে পারবেন; উৎপাদন করতে পারবেন উচ্চমূল্যের ফল ও সব্জি। সর্বোপরি সবুজে বাঁচবে কৃষক, সবুজকে বাঁচাবে কৃষক ; সমৃদ্ধ হবে কৃষি প্রধান বাংলাদেশ।

আমাদের উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডটি ইতোমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এ বিষয়ে অসংখ্য ইলেকট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে ইতিবাচক খবর প্রকাশিত হয়েছে। গত বছরের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত 6th International Conference on Agriculture, 2019 (AGRICO,2019) এ উপস্থাপনের জন্যে আমাকে আমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়। সশরীরে উপস্থিত হয়ে সেটা উপস্থাপনের পরে আমাদের মডেল খামারবাড়িটি বিশ্ব কৃষির দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। একই ভাবে বিষয়টি সমাদৃত হয় বিগত নভেম্বরের মাসে ভারতের বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত International Conference for Reaserch, Industry & Livelihood(ACRIL, 2019) এ সমাদৃত হয়েছে। সেখানেও আমি আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম।

মডেল খামারববাড়ি স্থাপনের সবচে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে এটার জাতীয় স্বীকৃতি। আমাদের উদ্ভাবিত খামারবাড়িটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রকল্প আকারে দেশের সবগুলো জেলা ও উপজেলাতে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত একটা প্রকল্প ছকপত্র প্রেরণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দেয়া হয়। ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত কনসেপ্ট নোটটি প্রেরণ করা হয়েছে এবং সেটি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রকল্পাকারে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।